পাহাড়ীদের দুঃখে কর্ণফুলী কাঁদে

সোনা কান্তি বড়ুয়া

(১)

রাঙামাটি জেলার কর্ণফুলীর তীর জুড়ে পাহাড়ী মানুষেরা কাঁদে। মা কর্ণফুলী, তুমি বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য পাহাড়ী মানুষের দুঃখভরা হাহাকার শোন মা। নিস্তব্ধে নীরবে এই কর্ণফুলি তুমি বইছ কেন? বাংলাদেশের প্রশাসনের নৈতিকতার স্খলন দেখেও, মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ অলসভাবে বইছ কেন? সহজ সরল পাহাড়ী মানুষের দুর্বলতায় মৌন কেন? হাজার বছরের মানবতার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ পাহাড়ী জনতাকে মানবিক উন্মাদনায় সবল সংগ্রামে অগ্রগামী করে গড়ে তোলো না কেন? পাহাড়ী কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়,

”আমার মায়ের রক্ত হাতে নিয়ে আমি কথা বলি,
হোলী খেলেছিল যারা আমার মেয়ের রক্ত নিয়ে,
আগুন জ্বালিয়ে যারা শবের উপর নেচেছিল।
এই শেষ অন্ধকারে তাদের সবার কথা বলি,
আজ যারা চুপ করে ছিল যারা কিছু দেখেও নি,
একাকার মনে যারা অনায়াসে ছিল অন্য মনে,
দলের ভিতর যারা দলবৃত্তে অন্ধ হয়েছিল,
আমি শতাব্দীর আমি আদিঅন্ত-হারা মহাদেশ।
আমি এই শতাব্দীর শহিদ শিখর থেকে বলি।
মৃত্যুর ভিতরে আজ কোথাও মৃত্যুর নেই লেশ।
দেখো এই মৃত্যুর মধ্যে কোথাও মৃত্যুর নেই লেশ।” (শহিদ শিখর : শঙ্খ ঘোষ)।

ধর্মের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী গরীব, দিনমজুর ও তাদের স্ত্রী-সন্তানদের গুলি করে কুপিয়ে মারবে জামাতের অত্যাচারী মালিকদের ভাড়াটে খুনিরা। তারপর লোক দেখানো ধরপাকড়াও হবে। বিচার কেন হবে না? পাহাড়ীরা জামাতের দলের লোক নয় বলে। রামু চাকমা, দিনু ত্রিপুরা যাদের ঘরের মেঝেতে এলামেলো মৃতদেহ, মেয়ের পিঠের উপর মায়ের পা, দিদিকে জরিয়ে ধরা ভাই, নানা বর্ণনায় দেখা যায়, ঘরের মধ্যে অন্ধকার মেঝেতে খড় বিছানো। মনের দুঃখে পাহাড়ী কবি আবার পড়েন, “যেন এই আমার মাটি এই কাল আমার দেশকাল,/ জালিয়ানওয়ালা বাগ এইবার হয়েছে আরওয়াল।” জামাতের কায়েমি স্বার্থচক্রের সঙ্গে যেমন বাংলাদেশের পুলিশ বা প্রশাসনের তেমনিই রাজনৈতিক দলগুলির ও খুটি বাঁধা। তাই এরা সমস্ত জানলেও আগে দেখবে নিজের বিশেষদলের স্বার্থকে। দরিদ্র পাহাড়ী মানুষের জীবন মৃত্যু তারা দেখবে না। ইতিহাস বাঁচানোর কোনো দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতাদের মনে থাকেনা। অন্ধ জামাতি সাম্প্রদায়িকতার কথা আমরা

পেয়ে যাই শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতায়, ”সমস্ত মাঠের বিন্দু আমারই ধর্মের ধান বোনা,/ সূচ্যগ্র মাটিও আমি অন্য কোনো শরিকে দেবোনা।” মনে হয় মানুষের বদলে এইখানে ধর্মই প্রধান হয়ে ওঠে, শুধু তা নয়, অন্য ধর্মকে ধ্বংস করেও দিতে চায় জামাত। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা- সূর্য্যে প্রতিভাত হয় জামাতের সাম্প্রদায়িক কলঙ্ক। জামাতের কাছে যুদ্ধাপরাধীরা কি অমাবস্যার আলো?

(২)

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ কর্ণফুলীর তীরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সেই সময়ের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর ”স্বাধীনতা ঘোষণার সনদ পত্র” পাঠ করেছিলেন। তারপর কর্ণফুলী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। রাজনীতির অসংখ্য জোয়ার ভাটায় কর্ণফুলী প্রবহমান। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। পাকিস্থান আমলের আয়ুব খান থেকে দেশের এরশাদ সরকার বারবার অনেকবার বাঙালিকে ধোঁকা দিয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলা দেশের এ কি দশা হলো? একটার পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার সুরাহা নেই। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর রাজনৈতিক সুনামীর ঢেউ দিয়ে পাহাড়ী জনগনের অস্তিত্ব বিলীন পথে তাহা আজ ”কর্ণফুলীর কান্না” হয়ে জাতীয় ডকুমেন্টারিতে জলছবি হয়ে বিরাজমান। চট্টগ্রামের জনতার কণ্ঠে আজ ও ধ্বনিত হয়, ”চাটগাঁইয়া নৌজোয়ান আঁরা হিন্দু মুসলমান, / কর্ণফুলীর পানিত হে ভাই জুড়াইরে পরান।” কর্ণফুলী পাপকে ক্ষমা করে না। কতো ইতিহাস জানে, কিন্তু কর্ণফুলী কথা বলে না। কেন বলে না?

পরে শাহেনশা' জিয়াউর রহমান রাজনীতির পাপ ও দুর্নীতি ঢাকতে ধর্ম এবং রাজাকারদের নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিলেন তারই সুগোয্যাপত্নী খালেদা জিয়ার জোটসরকার বাঙালির দুর্ভাগ্যের পরিহাসে আজ পাঁচ বছরের পরে হাওয়া ভবনের রাজপুত্র তারেকের নেতৃত্বে লুটপাট ৪ লক্ষাধিক কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীগণ দুর্নীতির সাথে জড়িত এবং এর শেকড় খুব গভীর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দুর্নীতিবাজরা মনে করেন যুগে যুগে অর্থ, পেশী, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে তো এভাবে সত্য পালটায়। রাজনৈতিক নেতা বা প্রধানমন্ত্রী একজন মানুষ এবং তার মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। রাজনৈতিক শক্তির জোরে দেশের অর্থনীতিতে দুর্নীতি চালু করে স্বজন পোষণ করবে, দেশের মানুষকে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী দিয়ে পদদলিত করে রাখবে এমন আস্ফালন করা বৃথা। কি সাধ্য খালেদার জোট সরবারের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক সুস্থ চেতনাকে নষ্ট করার, ভারসাম্যহীণ করে দেবার। বাংলাদেশে মানুষ চিন্তিত আজ নিজের জীবন নিয়ে। দেশের অস্বাভাবিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পর কি হবে?

দুর্নীতির অচীন পাখী রাষ্ট্র ক্ষমতার অঙ্গনে কেমনে আসে যায়? তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বড় ছেলে দুর্নীতিবাজ তারেক রহমানকে ৭ই মার্চ মধ্যরাতে যৌথবাহিনী ক্যান্টনম্যানস্থ ৬নং মইনুল রোডের

রাজকীয় বাসা থেকে গ্রেফতার করে। যেমন কর্ম তেমন ফলের সময়ে খালেদার ভাবমূর্তি হারিয়ে যেতে বাংলাদেশের অনেকের হয়তো মনে পড়ে,"জেলখানায় ফেলে আসা দিনের রানী হয়ে বসে আছ ভাড়া করা পোষাকে, তুমি মহারানী নও।" তাইতো মহারানী হয়ে সিংহাসনে বসলে টাকার ঝনঝনানিতে বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়ে স্বজনপ্রীতিতে দেখতে পায় লোভের আলাদিনের চেরাগ। তারেক সাহেব দুর্নীতির রাজপুত্র হয়ে মামা সাঈদ ইস্কান্দারের সাথে ব্যবসায় নেমে পড়েন এবং টাকা দিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্টা করার দূর্বুদ্ধি মাথায় নিয়ে হয়তো ভাবেন,"আমি হব রাজার কুমার, মা হবে রাজরানী।" মনে হয় মহাভারতের আর এক এপিসডের সুটিং হচ্ছে বাংলাদেশে।

মোট কথা, একাধিক রাজনৈতিকদল ও জীবন দর্শনে দীর্ঘস্থায়ী সহ অবস্থান আমাদের বাঙালি সমাজে অনিবার্য। বিদ্বেষযুক্ত রাজাকার সহাবস্থানের সাথে আমরা পরিচিত। সেটা হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর ভয়াবহ। কিছু ভেদাভেদ, কিছু ঘর্ষণ সহনীয় একটা মাত্রার ভিতর। মাত্রার বাইরে কিন্তু সমাজ সভ্যতার পক্ষে এটা নিশ্চিত ধ্বংসের পথ। দুর্নীতি ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার অধিকার সভ্যতার অঙ্গ। একই সঙ্গে, কোনো স্থায়ী রাজনীতি বা ধর্মই মানবিকতার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নয়, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের এই বিশ্বাসই যুক্তিসংগত। শ্রদ্ধাপূর্ণ সহ অবস্থানের দৃষ্টিতে এটাই শ্রেয়।

কিন্তু বাংলাদেশে একটা চক্র ঘুরে আসার পর সমাজ ও সময়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তাশীল মানুষ স্তম্ভিত। নৈতিক চরিত্র সহ সদাচার না থাকলে রাজনীতিতে দুর্নীতি প্রবেশ করবেই। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ. আহমেদ সহ সশস্ত্র বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে দুর্নীতি দূর করে ভোটের দিন কবে শুরু করবেন? তাই আমাদের প্রশ্ন, আজকের তত্ত্বধায়ক সরকার মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেফতার না করলেও দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ আরো অনেক মন্ত্রী, ব্যবসায়ী এবং সন্ত্রাসীকে জেলখানায় আটক করে রেখেছে। এই সরকার কি দুর্নীতির অচীন পাখীর পায়ে বেরি বেঁধে দিয়ে দুর্নীতির কারখানা বন্ধ করতে পারবেন? লেফটানেন্ট জেনারেল এরশাদ প্রথমে ক্ষমতায় এসে দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে ছিলেন। তারপর কি হ'ল আমরা সবাই জানি। এখন আমরা জানিনা, আজকের সেনাপ্রধানগণ কোন পথ অনুসরণ করবেন? আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, "রাজনীতির গলিতে যদি কেউ একবার আসে, সেই তো ফাঁসে।" আমেরিকান সৈন্য দেশে এলো। দেখি কি হয়?

(৩)

বিগত ছত্রিশটি বছর ধরে নানা অত্যাচারে জর্জরিত বাংলাদেশ। বিগত ২০০5 সালে ১৭ই আগষ্টে আমাদের দেশমাতৃকার বুকে ৬৩টি জেলা জুড়ে একসাথে পাঁচশত বোমা মেরেছিল এবং বাংলাদেশের হবু খলিফা হবার খায়েস হয়েছে জামা'আতুল মুজাহিদীন নামক নারকীয় কীট সদৃশ্য পঙ্গপালদের। নানা কারনে বাংলার মানুষদের পূঞ্জীভূত স্বপ্ন ভঙ্গ

হলো কেন? রবিঠাকুরের ভাষায় বাঙ্গালি মন বলে, “আমি ঢালিব করুণা ধারা / আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা / আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া / আকুল পাগল পারা। / কেশ হেলাইয়া ফুল কুড়াইয়া / রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া / রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি। / শিখর হইতে শিখরে ছুটিব/ ভুধর হইতে ভুধরে লুটিব। হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি। / এত কথা আছে এত গান আছে / এত প্রাণ আছে মোর / এত সুখ আছে- এত সাধ আছে- প্রাণ হয়ে আছে ভোর।”

বঙ্গবন্ধু পাষাণ কারা ভেঙ্গে আমাদেরকে স্বাধীণতার অমৃত ভান্ড দান করে গেছেন। আমরা কি স্বাধীনতার অমৃতের সাধ ভোগ করতে পেরেছি? বাঙ্গালির দুর্ভাগ্যে পায়ের নিচের জমিকে ধর্মান্ধরা লুট করে নিয়ে গেছে। এবং তাদের বিবেকের দংশণ নেই। প্রশ্ন হলো, শান্তিময় ধর্মকে তড়োয়ালের মতো ব্যবহার করে আমাদের জাতির পিতাকে স্বপরিবারে খুন করে বাংলার জনগনমনের ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমূলে ধংস করে রাজনীতির সিংহাসন অধিকার করে দিনের পর দিন জোট সরকার উন্মত্ত তান্ডবলীলাঘ বাংলাদেশের মানবতার অনিষ্ঠ সাধন করেছিল।

এই প্রসঙ্গে হুমায়ূন আজাদের মতবাদটি প্রনিধানযোগ্য, “মানুষ ধর্ম দ্বারা আক্রান্ত, এবং বিশেষ ধর্মের মানুষ আক্রান্ত ঐ ধর্মের মানুষদের দ্বারা, মুসলমান আক্রান্ত মুসলমানের দ্বারা, হিন্দু হিন্দুর দ্বারা, তাই মুসলমনের হাত থেকে মসুলমানকে , হিন্দুর হাত থেকে হিন্দুকে বাঁচানো দরকার। ... এই অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে মানুষকে হয়ে উঠতে হবে মানুষ।” গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল তাতে এই নতুন রাষ্ট্রে চারটি স্তম্ভের উল্লেখ আছে (১) গণতন্ত্র (২) জাতিয়তাবাদ (৩) সমাজতন্ত্র এবং (৪) ধর্মনিরপেক্ষতা। অদূরদর্শী বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাগণ ধর্ম ব্যবসায়ীদের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং সাম্প্রদায়ীক স্বার্থে আবিলতায় পঙ্কিল হয়ে আছে বাংলার ধর্মব্যবসায়ীদের মনমানস-জগত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ২০০১ সালে নির্বাচণের পর সংখ্যালঘু জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জোট সরকারের মদমত্ত রাজনৈতিক টর্নেডো। একদিকে যেমন মানুষের রক্তে হোলিখেলা হলো মাটির উপর তেমনি আরেক দিকে মা বোনের ইজ্জত পর্যন্ত অব্যাহতি পেলোনা ভোগ লালসা থেকে। মানুষের দরবারে অত্যাচারিতের দুঃখের দহনে করুণ রোদনভরা ফরিয়াদে বাংলার আকাশ বাতাস কেঁদে কেঁদে গুমরে উঠেছিল। আগামী নির্বাচনের পরও কি মৌলবাদী জঙ্গীরা সংখ্যালঘুদেরকে আক্রমণ করবে?

এর মানে অবশ্যই এই নয় যে, মতভেদের রাজনীতি মুছে যাবে। ভিন্ন মত এবং যুক্তি তর্কই গণতন্ত্রের বেঁচে থাকার জিয়নকাঠি। গণতন্ত্রের চাহিদাতে রাজপথে রাজনীতি নামবে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচনের ভোট অনুষ্ঠানে থাকবে সাধারণ মানুষের প্রাণস্পন্দন। ভয়ে নয়, র্নিভয়ে তারা তুলে নেবে নিজেদের মনমত প্রজ্ঞা অস্ত্র, রাষ্ট্র শক্তিতে ক্ষোপ জানাতে। কিন্তু দুর্নীতি এবং ভোটের নামে যে বিপর্যয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে, তা শেষ না হলে গণতন্ত্রের প্রসাদ কখনোই পৌঁছাবে না জনসাধারণের কাছে। রাজনৈতিকদল এবং

প্রক্রিয়ার উপর আস্থা চলে যাবে। যুগের এই নতুন চাহিদায় বাংলাদেশের রাজনীতি কর্ণফুলি নদীর মতো বাঁক বদলাবে কি?

লেখক এস. বড়ুয়া, কানাডা প্রবাসী রাজনৈতিক ভাষ্যকার, বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ও কলামিষ্ট।

barua_s@hotmail.com